সকালে ঘুম থেকে উঠে পানি পানে যত উপকার

শরীরের ৭০ শতাংশই পানি দিয়ে তৈরি। শরীরে পানির স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় রাখা খুবই জরুরি। রাতে ঘুমানোর আগে পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। আর রাতে ঘুমানোর পর বেশ কয়েক ঘটনা শরীরে কোনো পানি পৌঁছে না।

সকালে উঠেই আগে এক গ্লাস পানি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

আসুন জেনে নিই সকালে ঘুম থেকে উঠে পানি পানে যেসব উপকার-

১. পানি খেলে ক্যালোরি ইনটেক কম হয়। কারণ শরীরে পানির ঘাটতি না থাকলে চট করে খিদে পায় না। তাই যারা ওজন ঝরানোর চেষ্টা করছেন, তাদের সকালে উঠেই পানি খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।

২. সারা রাত ঘুমানোর কারণে সকালে আমাদের শরীরে পানির ঘাটতি দেখা দেয়। সেই কারণে সকালের প্রথম ইউরিন গাঢ় রঙের হয়। তবে এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। ইউরিনের রঙ সবসময় শরীরে পানির পরিমাণ বোঝায় না।

৩. কিডনির কাজ হলো শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেয়া। আর তার জন্য শরীরের যথেষ্ট পানির প্রয়োজন। সকালে হোক বা একটু বেলায় পানির ঘাটতি যেন শরীরে না থাকে।

৪. সকালে উঠেই যে পানি খাওয়া খুব জরুরি এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সকালে উঠে পানিপানের মধ্যে কোনো খারাপ দিক নেই। তাই এই অভ্যাস আপনার থাকলে, আপনি তা চালিয়ে যেতেই পারেন এমনটিই জানাছেন গবেষকরা।

তথ্যসূত্র: কলকাতা২৪

ডিম খেলে কী হৃদরোগ-স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে?

আমাদের অনেকেরই ধারণা– ডিম খেলে হৃদরোগ বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। তবে এ ধারণা ভুল। টানা ৩২ বছরের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জরিপের ভিত্তিতে এ তথ্য জনিয়েছেন গবেষকরা।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষকের নেতৃত্বাধীন একটি দল এ গবেষণা জরিপ পরিচালনা করেন। গবেষক দলটি দুই লাখ ১৫ হাজার ৬১৮ নারী-পুরুষের খাদ্যতালিকার ওপর ৩২ বছরে ধরে নজর রেখেছেন। এসব নারী-পুরুষের খাদ্যতালিকায় সপ্তাহে এক থেকে ৫টি করে ডিম ছিল।

গবেষক দলটি ডিম খাওয়া ও হৃদরোগ বা কার্ডিওভাসকুলার ব্যাধি সংক্ষেপে সিডিভির মধ্যে সম্পর্ক দেখতে পায়নি।

গবেষক দলটি আরও দেখতে পেয়েছে, দিনে যারা একটির বেশি ডিম খান, তাদের সিভিডিতে আক্রান্ত হওয়ার তুলনামূলকভাবে বেশি আশঙ্কা রয়েছে। তবে তাদের মধ্যে লাল গোশত বা রেড মিট খাওয়ার প্রবণতাও বেশি।

এ ছাড়া তাদের বডি মাস ইনডেক্সের সূচকও বেশি। মানে তারা তুলনামূলকভাবে ওজনে বেশি। এ গবেষণাবিষয়ক নিবন্ধ ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষক দলটি ডিম খাওয়া ও হৃদরোগ বা কার্ডিওভাসকুলার ব্যাধি সংক্ষেপে সিডিভির মধ্যে সম্পর্ক দেখতে পায়নি।

গবেষণা নিবন্ধ লেখক ডা. জিন ফিলিপ ড্রুইন চারটিয়ার বলেন, ডিম খাওয়ার সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্কের বিষয়ে অনেক বিতর্ক চলছে।

এর আগে স্বাস্থ্য-সমীক্ষাগুলোতে হৃদরোগের সঙ্গে ডিমের সম্পর্ক নিয়ে যেসব তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, তাদের পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য-গবেষণার ভিত্তিতে দেখা যায়, দিনে একটি ডিম খাওয়ার সঙ্গে হৃদরোগের কোনোই সম্পর্ক নেই।

তবে এখানে একটি বিষয় রয়েছে, তা হলো– চিকিৎসক যাদের ডিম খেতে

নিষেধ করেছেন, তারা এ নিবন্ধের ভিত্তিতে ডিম খাওয়া শুরু করবেন না। তারা ডিম খেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

তথ্যসূত্র: পার্সটুডে

৫ লক্ষণে বুঝবেন শিশুর পেটের কৃমি, কী করবেন?

কৃমির সংক্রমণ হওয়া শিশুদের জন্য খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তবে কিছু লক্ষণ রয়েছে যা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন শিশুর পেটে কৃমি হয়েছে।

অনেক সময়েই দেখা যায়, শিশুর মেজাজ ভালো থাকে না।
আর তার পায়ুদ্বারে ইরিটেশন, মাঝেমাঝে পেটে ব্যথা, সঙ্গে বমি। শিশুদের ক্ষেত্রে এসব সমস্যা দেখা দিলে অনেক বাবা-মা চিন্তা করেন শিশুর পেটের সমস্যা হয়েছে।

জেনে রাখা ভালো এসব সমস্যা পেটে কৃমির লক্ষণ হতে পারে। তবে আপনাকে জানতে হবে কৃমি কেমন হয়, এর লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে।

কৃমির সমস্যা কেন হয়?
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অপূর্ব ঘোষ বললেন, সাধারণত মলমূত্র, নখের ময়লার মাধ্যমেই শিশুর পেটে কৃমির সংক্রমণ হয়ে থাকে।

তিনি বলেন, শিশুরা খেলতে খেলতে মুখে হাত দেয়, এমনকি খেলনাও মুখে পুরে ফেলে। বাইরে হাঁটাচলার কারণে কৃমি শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া শিশুরা হামাগুড়ি দিতে শুরু করলে বা নতুন হাঁটতে শেখার সময় থেকেই কৃমির সংক্রমণ শুরু হয়। তাই শিশু মাটিতে থাকার সময়ে একটু নজরে রাখুন।

৫ লক্ষণে বুঝবেন শিশুর কৃমি

সাধারণত শিশুদের মধ্যে কৃমি সংক্রমণের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তবে শিশুর আচরণে কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

আসুন জেনে নেই শিশুর কৃমি হওয়ার কিছু লক্ষণ-

১. ঘন ঘন পেটে ব্যথা ও খিদে কম পাওয়া।

২. খাবার খেলে যদি পেটে ব্যথা করে তখন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৩. অনেক শিশু আবার অকারণেই থুতু ফেলতে থাকে বা থুতু ছিটায়।

৪. খিমচে দেয়, কামড়ে দেয়। কৃমির উপদ্রব বাড়লেই কিন্তু এ ধরনের লক্ষণ দেখা যায়।

৫. অনেক সময় মলের মাধ্যমেও কৃমি বেরিয়ে আসে। তাই স্টুলের দিকেও নজর রাখতে হবে।

পরীক্ষা করে দেখা যায়

শিশুর পেটে কৃমি হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য স্টুল এগজ়ামিনেশনও করানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে এক দিনে নয়, পরপর তিন দিন মল পরীক্ষা করাতে হবে। তাতে কৃমি বেরোলে নিশ্চিত হতে পারবেন। তবে অনেক সময়ে এই পরীক্ষাতেও কৃমি ধরা পড়ে না। তখন চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ব্যবস্থা নিন। প্রয়োজনে ওষুধ দিন।

চিকিৎসা

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. চয়ন গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, ৩ বছর বয়স থেকে ৬ মাস পর পর শিশুকে কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে। ১২ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত এই ওষুধ খাওয়ানো যায়। এ ছাড়া জরুরি হল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। কৃমির সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাও জরুরি। যে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে

১. সন্তানের খাবার, পানি , এমনকি ন্যাপি বদলানোর আগেও হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজারও ব্যবহার করতে পারেন।

২. শিশুটি বাইরে থেকে খেলে বা ঘুরে এলে অবশ্যই ভাল করে সাবান দিয়ে তার হাত-পা ধুয়ে দিন।

৩. শিশুর নখ পরিষ্কার রাখতে হবে ও নিয়মিত নখ কাটতে হবে। খেয়াল রাখুন, সে যেন নখ না খায়। নখের কোণে যে ময়লা জমে, তার থেকেও কিন্তু কৃমি প্রবেশ করতে পারে শরীরে।

৪. ফল, আনাজপাতিও বাজার থেকে এনে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। পরে খেতে হবে।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

যেভাবে মাংস খেলে করোনা ঝুঁকি কমে

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৪৮৩ জনে দাঁড়িয়েছে। এতে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৮৪০ জন। এর মধ্যে চীনের মূল ভূখণ্ডেই আক্রান্ত হয়েছেন ৮০ হাজার ৬৫১ জন। আর মারা গেছেন ৩ হাজার ৭০ জন। অন্যদিকে, এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৫ হাজার ১৯০ জন।

করোনার ভয়ে অনেকে মাছ-মাংস খাওয়া থেকে দূরে থাকছেন। কারণ অনেকেই মনে করছেন এই ভাইরাস মাছ-মাংসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে শরীরে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কেউই মাংস খাওয়ায় বাধানিষেধ দেননি। তবে তারা মাংস খাওয়ার কিছু নিয়ম জানিয়েছেন। আসুন জেনে নেই যেভাবে মাংস খেলে করোনাভাইরাসের ঝুঁকি কমবে-

১. মাংস কেনার আগে দেখে নিন মাংস টাটকা কি না। কারণ বাসি মাংস থেকে অন্য সংক্রমণ ছড়াতে পারে। মাংস বাসি হলে তাতে অন্য জীবাণু ধারণ করার আশঙ্কাও বেড়ে যায়।

২.বার্গার, পিৎজা বা চিকেনে যে সব মাংস ব্যবহার করা হয়, তারাও অধিকাংশই প্যাকেটজাত কিংবা প্রিজারভেটিভ মেশানো। এসব খাবার না খাওয়াই ভালো। ৩. গরম পানিতে মাংস ধুয়ে নিন। গরম পানিতে লবণ দিয়ে মাংস ধুলে মাংসের গায়ে থাকা রোগজীবাণু অনেকটাই চলে যায়।

৪. মাংস যেন ভালোভাবে সিদ্ধ হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। যে তাপমাত্রায় মাংস রান্না করে খান, তাতে কোনো ভাইরাস বেঁচে থাকতে পারে না। তাই মাংস সিদ্ধ হলেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

৫. ফ্রিজেও বেঁচে থাকতে পারে করোনা গ্রুপের কোভিড-১৯ ভাইরাস। তাই ফ্রিজ পরিষ্কার রাখতে হবে। মাংসসহ যে কোনো খাবার ফ্রিজে রাখার পর তা গরম করে খাওয়ার আগে বের করে কিছুক্ষণ বাইরে রাখুন। ভাল করে গরম করে খান।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

যেসব খাবার খেলে কাছেও ঘেঁষবে না করোনা

করোনাভাইরাস নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে প্রতিনিয়ত। বিশ্বজুড়ে এ পর্যন্ত ৯০ হাজারের বেশি মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃতের সংখ্যা ৩ হাজার ৩৮৭।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জন্য মাস্ক ব্যবহার ও হাত ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া কিছু খাবার রয়েছে, যা খেলে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ করা যায়।

আসুন জেনে নিই এমন কিছু খাবার সম্পর্কে যা করোনা প্রতিরোধ করে।

রান্নায় আদা

খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন আদা। রান্না করা খাবারে আদা ব্যবহার করুন। পারলে দিনে দু-একবার আদা চাও খেতে পারেন।

কাঁচা রসুন

এই ভাইরাস প্রতিরোধে খেতে পারেন রসুন। তবে রান্না করা রসুনে সেই গুণ মেলে না। তাই পানি ফুটিয়ে কিংবা কাঁচা রসুন খেতে পারেন।

সবুজ সবজি

খেতে পারেন সবুজ সবজি। সিদ্ধ ও রান্না করে খেতে পারেন সবজি।

দই খান

প্রতিদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দই খান। তাতে দেখবেন আপনার ত্বকের ঔজ্জ্বল্য যেমন ফিরবে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

হলুদ গোলমরিচ দুধ ও ঘি

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য হলুদের সঙ্গে গোলমরিচ, নারিকেল দুধ ও ঘি মিশিয়ে খান।

গ্রিন টি

খেতে পারেন গ্রিন টি। প্রতিদিন ২-৩ কাপ করে এই চা খান। তাতে দেখবেন অনেক বেশি তরতাজা হয়ে গেছেন আপনি।

ফল খান

নিত্যদিনের খাদ্যতালিকায় ফল রাখুন। বিশেষত পেয়ারা, জাম খেতে পারেন।

প্রোটিন খাবার

ভাইরাসের কোষকে ধ্বংস করার জন্য খাদ্যতালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাবার রাখতে পারেন।

কুমড়োর দানা

কুমড়োর দানা শুকিয়ে খেতে পারলেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। এ ছাড়া বাঁধাকপি, পেঁয়াজকলি, টমেটো, পেঁয়াজ, আদা এবং রসুন একসঙ্গে সিদ্ধ করে খেতে পারেন। তাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

তথ্যসূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

সন্তান কী গুটিয়ে থাকে? শেখান

৮ কৌশল

অনেক শিশু নিজ ঘরে পরিবারের সঙ্গে চনমনে ও প্রাণোচ্ছ্বল। কিন্তু বাইরে গেলে দেখা যায় সে কারও সঙ্গে মিশতে ও কথা বলতে চায় না। লোকজনের সামনে এলেই গুটিয়ে যায়।

বাইরে বা স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যাওয়া, অন্যদের সঙ্গে গল্প করা বাদে গুটিয়ে থাকে। গুটিয়ে থাকলে হবে না। আপনার সন্তানকে অন্য শিশুদের সঙ্গে মিশতে দিতে হবে।

স্কুল, পড়াশোনা, টিউশন, কো কারিকুলামের চাপে অনেক সময় শিশুদের খেলা বন্ধ থাকে। এটি করবেন না। যা শিশুর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এসব গুটয়ে থাকার সমস্যা দূর করতে হবে। তবে তার একার চেষ্টায় নয়। এ দায়িত্ব নিতে হবে শিশুর বাবা-মায়ের।

আসুন জেনে নিই শিশুকে কৌশলী বানাতে কী করবেন?

১. সারাক্ষণ কুক্ষিগত না রেখে অন্য শিশুদের সঙ্গে মিশতে দিন।

২. শিশুকে গুছিয়ে কথা বলতে শেখান। সাহায্য করুন গুছিয়ে উত্তর দিতে। চোখের সামনেই রেখেও সবার সঙ্গে সাবলীলভাবে মিশতে দিন।

৩. শিশুরা অভিযোগ একদম পছন্দ করে না। সন্তানের সামনে তার নেতিবাচক দিক নিয়ে হাসিঠাট্টা ও মশকরা করবেন না।

৪. মিশুকে অতিরিক্ত রাগ দেখাবেন না। অন্তর্মুখী শিশু অনেক সময় বাইরে মিশতে পারে না। বন্ধুরা মেলামেশা করতে পারলেও সে হয়তো দলে থেকেও সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারে না। এমন সময় তার সম্পর্কে অন্যের কাছে নেগেটিভ মন্তব্য করবেন না। বরং সে যাতে সবার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, বন্ধুত্ব করতে পারে, সে ক্ষেত্রে নিজেই এগিয়ে আসুন।

৫. অচেনা কেউ কোনো প্রশ্ন করলে নিজে উত্তর দেবেন না। কিছু জিজ্ঞাসা করলে অনেক সময় অনেক শিশুই তার উত্তর দিতে চায় না। এ ক্ষেত্রে অনেক মা-বাবাই তার জড়তা ঢাকতে বা শিশুকে উত্তর না দিতে দিয়ে নিজেই জবাব দেন। শিশুকে নিজে উত্তর দিতে শেখান।

৬. শিশুকে বিকালে খেলার মাঠে নিয়ে যান। খেলাধুলো করালে সন্তান নিজেই মিশতে শুরু করবে অন্যদের সঙ্গে।

৭. সন্তানকে অকারণে চাপ দিয়ে, জোর করে পারফর্ম করাবেন না।

৮. বাড়িতে অতিথি কেউ এলে তাকে পানির গ্লাসটা এগিয়ে দিতে বলেন। দোকানে গেলে কোনো কিছুর দাম জানতে চাওয়া, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিজের সুবিধা-অসুবিধার অন্তত বেসিকটুকু জানিয়ে রাখা, এগুলোয় ওকেই এগিয়ে দিন। নিজে দূর থেকে পাহারা দিন সন্তানকে।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

গরমে তেলতেলে ত্বকের যত্ন

চলছে বসন্ত মাস। এ সময়ে প্রচুর গরম পড়ে। আর গরমে যাদের ত্বক তৈলাক্ত তারা পড়েন বিপদে। কারণ ত্বকে অতিরিক্ত তেল ও ময়লা জমে বাড়ে ব্রণের প্রকোপ। তবে সঠিকভাবে যত্ন নিলে তেলতেলে ত্বকেরও সুরক্ষা করা সম্ভব।

আসুন জেনে নিই তেলতেলে ত্বকের যত্ন

১. ত্বক পরিষ্কার করা, টোনার ব্যবহার ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

২.গ্রিন টি টোনার ব্যবহার করতে পারেন। এটি অতিরিক্ত তেল দূর করবে। ময়েশ্চারাইজার অবশ্যই যেন অয়েল ফ্রি হয়।

৩. মরা চামড়া ও ব্ল্যাকহেডস দূর করতে সপ্তাহে একদিন ঘরে তৈরি স্ক্রাবার ব্যবহার করুন।

৪. তৈলাক্ত ত্বকে কিন্তু ব্ল্যাকহেডস জমে বেশি। মুলতানি মাটি, লেবু, কমলার খোসা, শসা, টকদই ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন ফেসপ্যাক হিসেবে। এটি প্রাকৃতিকভাবে ত্বক পরিষ্কার রাখতেও কার্যকর।

৫. ব্লটিং পেপার ছোট ছোট অংশে কেটে গ্রিন টি লিকারে ভিজিয়ে রেখে দিন। তেল বা ঘাম জমলে এটি দিয়ে মুছে নিন।

৬. তেলতেলে ত্বকে অতিরিক্ত মেকআপ করবেন না।

৭. অতিরিক্ত তেল-মসলা দেয়া খাবার না খেয়ে খাদ্য তালিকায় রাখুন তাজা ফল ও শাকসবজি।

সুত্র-যুগান্তর

গর্ভাবস্থায় যেসব ভুল মা ও শিশুর মৃত্যুঝুঁকি বাড়ায়

গর্ভাবস্থায় মায়েদের সবচেয়ে বেশি যত্নে রাখতে হয়। কারণ এ সময় সামান্য ভুলে হতে পারে অনেক বড় বিপদ। ক্ষতি হতে পারে মা ও শিশুর।

চিকিৎসকরা বলেন, নিজেদের ভাবনা-চিন্তার পরও থেকে যায় নানারকম ভুল।
আমাদের অনেকেরই ধারণা, গর্ভাবস্থায় নিজের ও সন্তানের জন্য খেতে হয় দুজনের মাপে। বেশিরভাগ সময়ই শুয়ে–বসে থাকতে হয়। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, এসব ধারণার কোনোটাই ঠিক নয়। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ মার্থা হাজরার মতে– গর্ভাবস্থায় বাড়িতে হবু মায়েরা নানারকম ভুল

ধারণার শিকার হন। কারণ এ সময় নানাবিধ শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এমনিই কিছুটা ভয় দানা বাঁধে। তার ওপর এসব ভুল ধারণা আরও বেশি করে উদ্বেগের জন্ম দেয়।

আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় যেসব ভুলে মা ও শিশুর জীবনঝুঁকি বাড়ে-

ভুল ১. খেতে হবে দুজনের মাপে

অনেকেই বলে থাকেন– গর্ভাবস্থায় দুজনের মাপে খেতে হয়। এ ধারণা ভুল। ছোট্ট ভ্রূণের এত খাবার লাগে না। অতিরিক্ত খাবারে হবু

মায়ের ওজন বাড়ায়। ফলে বাড়ে ডায়াবেটিস, প্রেশারসহ আরও অনেক জটিল রোগ। ফলে মা ও শিশুর জীবনঝুঁকি বাড়ে।

প্রথম তিন মাস পুষ্টিকর খাবার খান, আগের মাপেই। তিন মাস পর থেকে মাত্র ২৫০–৩০০ ক্যালোরি বেশি খেতে হবে। একটা কলা, ছোট এক বাটি সিরিয়াল আর দুধ।

ভুল ২. ছোটখাটো ওষুধ নিজেই খাওয়া যায়

গর্ভাবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া যাবে না। সাধারণত ওষুধ খেলেও শিশুর জন্মগত ত্রুটিসহ আরও অনেক রোগ হতে পারে। তাই বদহজম–কোষ্ঠকাঠিন্য, যাই হোক না কেন, ওষুধ খান চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে।

ভুল ৩. কম ঘুমিয়ে কাজ সেরে রাখা

গর্ভাবস্থায় ক্লান্ত থাকে শরীর। তার সঙ্গে কম ঘুম যুক্ত হলে স্বাস্থ্য ভাঙতে বাধ্য। কাজেই অন্তত ৭–৮ ঘণ্টা ঘুমান।

ভুল ৪. শুয়ে–বসে থাকতে হবে

দিনে আধাঘণ্টা অন্তত হালকা ব্যায়াম করুন। জোর–কদমে হাঁটা, যোগ ব্যায়াম ইত্যাদি না করলে ওজন বেড়ে ডায়াবেটিস বা হাইপ্রেশার হতে পারে। প্রসবে সমস্যা, মানসিক চাপ কমাতে, রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে ও প্রসবের জন্য শরীরকে প্রস্তুত করতেও ব্যায়ামের জুড়ি নেই। আর যত নড়াচড়া করবেন, গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধিও ভালো হবে এতে। তবে বলে খুব ভারী কাজ, পরিশ্রমের কাজ করবেন না। কিন্তু শরীরকে নানাভাবে সচল রাখতে হবে।

ভুল ৫: পছন্দসই খাবার নয়, চাই স্বাস্থ্যকর খাবার

মিষ্টি, ভাজাভুজি, মসলাদার খাবার কম খেতে হবে। কারণ এতে অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যেতে পারে ও হতে পারে অপুষ্টিও। মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হলে কিসমিস, খেজুর, ফল আর নোনতা খাওয়ার ইচ্ছে হলে বাদাম, কাজু, পেস্তা খান।

ভুল ৬: অ্যান্টিনেটাল ক্লাসে যাওয়ার দরকার নেই

প্রসবের পর কীভাবে চলবেন, ব্রেস্ট ফি, কী খাবেন, কী ব্যায়াম করবেন– এসব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পেতে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত

অ্যান্টিনেটাল ক্লাসে গেলে ভালো বই মন্দ হয় না।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

জীবাণুমুক্ত থাকতে কতক্ষণ হাত ধোয়া উচিত

সুস্থ থাকতে হলে হাত ধোয়া খুবই জরুরি। কারণ হাতে লেগে থাকা জীবাণু পেটে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে। হাঁচি-কাশি, জ্বরসহ নানা ধরনের ভাইরাস আক্রমণ বেড়েছে।

বর্তমানে চীন থেকে ছড়িয়ে পড়া নতুন করোনাভাইরাস তেমনই একটি ভাইরাস। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের কোনো টিকা আবিষ্কৃত হয়নি। এই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যক্তিগত সচেতনতা হচ্ছে একমাত্র পথ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্যমতে, নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণের পর লক্ষণ প্রকাশে সর্বোচ্চ ১৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এ ছাড়া তারা হাত ধোয়া ও মাস্ক পরার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

ডব্লিউএইচও জানিয়েছে, বিভিন্ন ধরনের ফ্লু ভাইরাস ও করোনাভাইরাসের সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে খুব বেসিক একটি অভ্যাস আমাদের সুস্থ রাখতে পারে। আর তা হচ্ছে নিয়মিত হাত ধোয়া।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভাইরাস হাতে অন্তত তিন ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে। এ জন্য হাত দিয়ে মুখে বা শরীরের অন্য কোথাও লাগলে জীবাণু দ্রুত আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই বারবার হাত ধুয়ে নিলে সংক্রমণের ঝুঁকি কমে।

হাত কখন ধুতে হবে

১. বাইরে থেকে ঘরে ফিরে প্রথমেই সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।

২. রান্নাবান্না করার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

৩. খাওয়ার আগে ও পরেও হাত ধুয়ে নিন।
৪. শিশুর ডায়পার পরিবর্তনের পরেও সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন। ৫. পশুপাখিকে স্পর্শ করার পর অবশ্যই হাত ধুতে হবে।

৬. কারও জ্বর হলে তাকে বা তার ব্যবহারের কিছু ধরার পর হাত ধুয়ে নিন।

৭. সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড হাতটা ঘষে ভালো করে ধুয়ে মুছে ময়েশ্চরাইজার লাগিয়ে নিন।

৮. বাইরে থাকলে পানি দিয়ে হাত ধোয়া সম্ভব না হলে ছোট স্যানিটাইজ়ার রাখুন। প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করুন।

৯. বাড়ির ছোটদেরও নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

সুত্র-যুগান্তর

অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকরা কেন সবুজ অ্যাপ্রন পরেন?

চিকিৎসকরা সাধারণত সাদা রঙের অ্যাপ্রন পরেন। তবে অস্ত্রোপচার করার সময় তারা সাদার পরিবর্তে সবুজ বা নীল রঙের অ্যাপ্রন পরেন।

প্রশ্ন হলো চিকিৎসকরা কেন সবুজ বা নীল রঙের অ্যাপ্রন পরেন।
আসলে সবুজ বা নীল রঙের অ্যাপ্রন পরার পেছনে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। অস্ত্রোপচার মানেই রক্তাক্ত ব্যাপার। অস্ত্রোপচার যত ছোট বা বড় যাই হোক না কেন রোগীর রক্তপাত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

আর অস্ত্রোপচারের সময় অ্যাপ্রনে রক্তের দাগ লাগাটা খুবই স্বাভাবিক। অস্ত্রোপচারের সময় যদি চিকিৎসকরা সাদা রঙের অ্যাপ্রন পরেন, তাতে রক্তের দাগ দেখতে খুবই খারাপ লাগে।

আর অপারেশন টেবিলে শুয়ে থাকা রোগীও সেটা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠতে পারেন। তাই সবুজ বা নীল রঙের অ্যাপ্রন পরাই ভালো।
বিজ্ঞানসম্মত ভাবে, সবুজ বা নীল আসলে লালের পরিপূরক রং। সবুজ বা নীল রঙের উপর লাল রং মিশিয়ে দিলে, তা কালো হয়ে যায়। সবুজ বা নীল অ্যাপ্রনের উপর কালো রং খারাপ মানসিক প্রভাব ফেলে না। রক্ত বলে মনে না হওয়ায় রোগীও মানসিক ভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন না।

সে কারণে শুধু অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকদের অ্যাপ্রন, হাসপাতালের পর্দা ও রোগীর বিছানার চাদরও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সবুজ বা নীল রঙের হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা